Vol. 41 | No. 2 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

Volume	41
Issue	2
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mobashwer Ali
Published online	February 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i2.7
Pages	167-174
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ওয়াকিল আহমদ, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি ৬৭ প্যারীদাশ রোড, ঢাকা ১১০০, ১৯৯৮, ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮, মূল্য ১৭৫.০০

এক

বাংলা সাহিত্যের সূচনা চর্যাপদ দিয়ে। চর্যাপদ ধর্মভিত্তিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। কেননা চর্যাগুলো বৌদ্ধ সহজযান মতবাদকে ভিত্তি করে রচিত। "বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহাদের ধর্মের তত্ত্বকথা লোকায়ত ভাষায় জনসাধারণের চিত্তে পৌছাইয়া দেওয়া।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস, নীহাররঞ্জন রায়)। চর্যাপদের পরিপূর্ণ বিকাশ বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলে – গোপাল (৭৫০) থেকে রামপাল (আ. ১০৭৭–১১২০) পর্যন্ত। পালরা দুর্বল হয়ে পড়লে সেনরা বাংলায় আসন গেড়ে বসে। বার শতকের মাঝামাঝি সমগ্র বাংলা সেনদের আয়ত্তে আসে।

সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য–আধিপত্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংস্কৃত সাহিত্য চর্চিত – জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ বা ধোয়ীর পবনদূত এর উৎকৃষ্ট নজির।

স্বভাবত চর্যাপদ দ্বারা চারশ বছর ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের যে সম্ভাবনা সূচিত হয়, সেন আমলে তা শুধু স্তিমিত নয়, স্তব্ধ হয়ে যায়। এজন্য সেকালে বাংলায় যে–সকল লৌকিক কাহিনী চণ্ডী, মনসা বা ধর্মঠাকুরের আখ্যান প্রচলিত ছিল, সেগুলো সাহিত্যিক রূপ লাভ করতে পারেনি।

সেনদের পরাজিত করে মুসলমানরা রাজকীয় শক্তিরূপে এদেশে এল তের শতকের সূচনায় (১২০৩)। এবং এর ফলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। মুসলমান সুলতানগণ উদার মনোভাবাপন্ন বলে দেশজ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি লৌকিক দেব–দেবী নিয়ে মঙ্গলকাব্য, রাধা–কৃষ্ণের প্রণয়লীলা নিয়ে বৈষ্ণবপদ এবং মুসলমানি কেচ্ছা–কাহিনী নিয়ে পুঁথি সাহিত্য রচিত হতে থাকে। মুসলমানি পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে নানারূপ কল্পনাশ্রিত বা রেমান্টিক কাহিনীকাব্য উল্লেখযোগ্য — যেমন, ইউসুফ–জোলেখা, লায়লী–মজনু, সয়ফুলমুলুক–বদিউজ্জামাল, পদ্মাবতী, চন্দ্রাবতী, হানিফা–কয়রাপরী, গুলে বকাওলী, বিদ্যাসুন্দর, মধুমালতী, সতীময়না–লোরচন্দ্রানী, গদা–মল্লিকা ইত্যাদি।

দুই

পনের থেকে আঠার শতক এই চারশ বছর ধরে অসংখ্য পুঁথি রচিত হয়েছে। এদেশের স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ার দরুন বহু পুঁথি নষ্ট হয়ে গেছে। আবার সংগৃহীত পুঁথির মধ্যেও সম্পাদিত পুঁথির সংখ্যা খুব বেশি নয়। আবদুল গফুর সিদ্দিকী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ড. এনামুল হক, ড. শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, ড. আহমদ শরীফ, সুলতান আহমদ ভুঁইয়া প্রমুখ কিছু কিছু পুঁথি সম্পাদনা করেছেন।

এই সকল সম্পাদিত পুঁথি অবলম্বনে ওয়াকিল আহমদ রচনা করেছেন 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান'। সুকুমার সেন এবং মমতাজুর রহমান তরফদার মুসলমানি পুঁথিকে এই শিরোনামে চিহ্নিত করেছেন। অতএব ওয়াকিল আহমদ শিরোনামের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করেছেন।

গ্রন্থটির ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৮-এ প্রকাশিত হয়েছে। ১ম সংস্করণ প্রকাশিত ১৯৭০, দ্বিতীয় ১৯৮৭-এ এবং তৃতীয় ১৯৯৫-এ। বাংলা রোমান্টিক কাহিনীকাব্য বা প্রণয়োপাখ্যান নিয়ে ইতঃপূর্বে কেউ কেউ স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন ; কিন্তু ওয়াকিল আহমদ বৃহৎ পরিসরে একটি সমগ্র ও সম্পূর্ণ আলোচনা করতে চেয়েছেন। অতএব মুসলমানি পুঁথি বিষয়ে তাঁর গ্রন্থটিকে আকর গ্রন্থের মর্যাদা দেয়া যায় এবং এ-কারণে গ্রন্থটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

লেখক গ্রন্থের প্রথমে একটি বিস্তৃত পটভূমি রচনা করেছেন। পুঁথির কাহিনীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি আরবি ফারসি কাব্যধারা, সংস্কৃত কাব্যধারা, হিন্দি-অবধি কাব্যধারা সন্ধান করেছেন। এমন কি ইউসুফ-জোলেখার কাহিনীর সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে বাইবেলও তাঁর আলোচ্য বিষয় হয়েছে।

পুঁথিগুলোর কাহিনীর উৎস সন্ধান করার পর লেখক এগুলোর মূলগত বৈশিষ্ট্য—একদিকে মানবরস, অপরদিকে অধ্যাত্মবাদ—দেখিয়েছেন এবং বাংলায় যে মানবতা প্রাধান্য লাভ করেছে, তাই তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়েছে। বাংলার মাটিতে মানবরস বা human interest প্রাধান্য লাভ স্বাভাবিক। এরপর তিনি কাব্যের মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্য, চরিত্রচিত্রণ ও বিশ্লেষণ, শিল্পরীতি, ভাষারীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এই সুবিশাল পটভূমি নির্মাণের পর তিনি মূলত নয়জন কবি ও তাঁদের কাব্য নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এঁরা হলেন—শাহ মুহম্মদ সগীর, দৌলত উজির বাহরাম খান, শাহ বারিদ খান, দোনা গাজী চৌধুরী, মুহম্মদ কবীর, কাজী দৌলত, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল এবং নওয়াজিস খান। অর্থাৎ, তিনি আমাদের জন্য রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের এক বিশাল জগৎ উন্মোচিত করেছেন।

তিন

গ্রন্থকার প্রসঙ্গ কথায় বলেছেন ঃ "প্রাচীনকালের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করব, এরূপ আশা পোষণ করে গ্রন্থখানি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করি। সাহিত্যের সুবিজ্ঞ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি এই আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছি। এ জন্য কাব্যের পাণ্ডুলিপি, রচনাকাল, কবি-জীবনী ইত্যাদি প্রশ্ন-কূটিল ও তর্ক-জটিল সমস্যায় প্রবেশ করিনি, বরং কবিকর্ম, কাব্যসৌন্দর্য, রসতাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের রূপ সার্থকতার উপর অধিক আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। মোট কথা, কাব্যের 'এস্‌থেটিক ভ্যালু' প্রাধান্য পেয়েছে।"

ওয়াকিল আহমদ মুসলমানি পুঁথিকে আধুনিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। ফলে তাঁর কাছে কাব্যরস প্রধান হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। এবং এখানেই অপরাপর পুঁথি গবেষকদের সাথে তাঁর মূলগত ব্যবধান। তবু তিনি প্রতি কবি ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে পাঠককে বিস্তারিত তথ্য জ্ঞাপন করেছেন। প্রথমে শাহ মুহম্মদ সগীর। সগীরের ইউসুফ-জোলেখার কাহিনীর সূত্র সন্ধান তিনি করেছেন ওল্ড টেস্টামেন্টে, কোরান শরিফে, ফারসি কবি ফেরদৌসী (৯৩৭-১০২০) ও আবদুর রহমান জামীর (১৪১৪-৯২) মধ্যে।

সগীরের কাব্য ধর্মোপ্যাখ্যান নয়, মানবিক প্রেমোপাখ্যান। মুসলমান সুলতানগণ বাংলা সাহিত্যে যে Human interest সঞ্চার করতে চেয়েছেন, সগীরের কাব্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সগীরের আরও একটি গুণ লেখক লক্ষ্য করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে অশ্লীলতার পরিচয় মেলে, ইউসুফ-জোলেখা এর উর্ধে। সগীর সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। আবার কাহিনীকাররূপে সগীরের কৃতিত্ব এই ঃ তিনি অবলীলায় গল্প বলে পাঠক বা শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন।

ইউসুফ-জোলেখার কাহিনী নিয়ে সগীরের পরবর্তীতে আরও পাঁচজন কবির নাম উল্লেখিত ও আলোচিত হয়েছে। এঁরা হলেন ঃ আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, গোলাম সফাতউল্লাহ, সাদেক আলী ও ফকির মহম্মদ। এঁদের মধ্যে আবদুল হাকিম ও গরীবুল্লাহ উল্লেখ্য।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের মধ্যে ইউসুফ-জোলেখার পর দৌলত উজির বাহরাম খানের লায়লী-মজনু আলোচিত হয়েছে। লায়লী-মজনুর কাহিনীর উৎস লেখক সন্ধান করেছেন আরবি, ফারসি সাহিত্যে। ইরানের জামী এবং ভারতের আমীর খসরুর প্রভাব দৌলত উজিরে থাকতে পারে।

আহমদ শরীফ লায়লী-মজনুকে ট্র্যাজেডি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ওয়াকিল আহমদ যুক্তিসহকারে আলোচনা করে দেখিয়েছেন লায়লী-মজনু ট্রাজেডি নয় এবং তাঁর মন্তব্য যথার্থ।*

দৌলত উজির বাহরাম খান একজন শব্দকুশলী শিল্পী। তাঁর সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "তাঁর বিষয়জ্ঞান, নাগরিক বৈদগ্ধ্য, পরিমার্জিত ভাষা সাবলীল প্রকাশভঙ্গী এবং সচেতন শিল্পবোধ তাঁর শিরোদেশে গৌরব মুকুট পরিয়ে দেবে।" এ-কারণে তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি।

কিন্তু তাঁর পর লায়লী-মজনুর কাহিনী নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাব্য রচিত হয়নি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শাহ বারিদ খান থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত তাই লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় উপাদান নিয়ে রচিত এই কাহিনী রচনায় শাহ বারিদ খান গীতিধর্মিতা ও নাটকীয়তার সমন্বয় সাধন করেছেন।

কিন্তু পরবর্তী কাব্য 'হানিফা-কয়রাপরী'তে দেখা যায় যুদ্ধের ঘনঘটা, অস্ত্রের ঝংকার, বীরত্বের আস্ফালন, রক্তক্ষয় ; এসকলের মধ্যে হৃদয়ানুভূতির যথার্থ প্রকাশ ঘটেনি। এবং এখানেই কবির ব্যর্থতা। এ-কারণে লেখক আক্ষেপ করেছেন এবং বলেন ঃ "আমাদের ধারণা কবির প্রতিভা ও শক্তি ছিল, কেবল সাধনা ও পরিচর্যার অভাবে উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে তিনি নষ্ট করেছেন।"

---

* বর্তমান আলোচক ট্রাজেডি নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন। দ্রষ্টব্য, গ্রীক ট্র্যাজেডি, শিল্পকলা একাডেমী (১৯৯৩)।

সয়ফুলমুলুক বজিউজ্জামাল–এর কাহিনী অবলম্বনে বাংলায় বেশ কয়েকজন কবি কাব্য লিখেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ্য দোনা গাজী চৌধুরী, তারপরেই আলাওল।

কাহিনীর উৎস আরব্য রজনী। রাজপুত্র সয়ফুলমুলুকের জন্য পরীবালা বদিউজ্জামালের প্রণয় এবং অনেক বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করে পরিশেষে মিলন— এই হল কাহিনীর উপজীব্য। খাঁটি প্রেম কোন বাধা মানে না, প্রেমের দুর্জয় শক্তির কাছে সকল বিপর্যয় তুচ্ছ হয়ে গেছে। তাই কাব্যটিকে রোমান্সের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে দোনা গাজী কাব্যটিকে ইন্দ্রিয়সর্বস্ব করে স্থূল রুচির পরিচয় দিয়েছেন। অতএব কাব্যটি যথার্থ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

ভারতীয় লৌকিক উপাদান অবলম্বনে মুহম্মদ কবীর লিখেছেন 'মধুমালতী'। লেখক কাহিনীর সূত্র সন্ধানে নিয়োজিত হয়ে ফারসিতে রচিত মনঝনের কাব্যের সাথে কবীরের মধুমালতীর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং বহিরাগত উপাদান বাংলায় কিভাবে গৃহীত হয়েছে তা দেখিয়েছেন। মনঝনের মধ্যে প্রেমকাহিনী বর্ণনায় রূপকের অন্তরালে সুফিতত্ত্ব প্রশ্রয় পেয়েছে, অথচ বাঙালি কবি তত্ত্ব বর্জন করে নিছক প্রেমকাব্য রচনা করেছেন। এসূত্রে মমতাজুর রহমান তরফদারের একটি উক্তি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

"বাংলার কবিগণ রূপকের আবরণটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হিন্দী রোমান্সগুলোকে ধর্মীয়ভাবে বর্জিত, নিছক প্রেমোপাখ্যানে পরিণত করেছেন। এর মূলে কাজ করেছে মানবীয়তাবোধ...।" এ–কথা শুধু হিন্দি নয়, ফারসি কাব্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বাংলার কবিদের নিকট মানবীয় রস মুখ্য এবং কবীর এর ব্যতিক্রম নন।

দোনা গাজীর সাথে কবীরের ব্যবধান এখানে যে, দোনা গাজী কুরুচির প্রশ্রয় দিয়েছেন, অথচ কবীরের মধ্যে সংযম ও শিল্পবোধের পরিচয় মেলে।

কবীরের পরবর্তী সৈয়দ হামজা দোভাষী পুঁথিকার হয়েও মধুমালতী রচনা করেছেন 'অবিমিশ্র বাংলা'য়, গ্রন্থে এ–কথা উল্লেখিত হয়েছে।

আরাকান অমাত্যসভায় বাংলা সাহিত্য পৃষ্ঠপোষিত হয়েছে। আরাকানের প্রধান অমাত্য আশরাফ খানের আদেশে দৌলত কাজী সতীময়না–লোরচন্দ্রানী কাব্য রচনা করেছেন। সতের শতকের পূর্বার্ধে কবি কাব্য রচনা শুরু করলেও তাঁর মৃত্যুতে কাব্যটি অসমাপ্ত থেকে যায়। এরপর আলাওল উজির সোলায়মানের আদেশে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে কাব্যের শেষাংশ রচনা করেছেন।

এই কাব্যের উৎস সন্ধানে ওয়াকিল আহমদ প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। মধ্যযুগের এই লোক-কাহিনী ভারতবর্ষে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সতের শতকে দৌলত কাজী বাংলায় এর কাব্যরূপ দেন আরাকানের অমাত্যদরবারে। অমাত্যসভার এই কবির বৈশিষ্ট্য লেখক নিরূপণ করেছেন ঃ "অমাত্যসভার কবি হিসাবে কাজী দৌলতের নাগরিক চেতনা বিকাশ লাভ করেছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, বিষয়জ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও যথার্থতা, রসরুচির পরিমার্জনশীলতা এবং বাক্‌ভঙ্গির দার্ঢ্য ও বৈদগ্ধ্য থেকে তাঁর শিক্ষিতমন, নাগরিক বুদ্ধি, সাংস্কৃতিক বোধ পরিস্ফুট হয়।" (পৃ. ২৩৪)।

দৌলত কাজী যেখানে কাব্য শেষ করেছেন, সেখান থেকে আলাওল শুরু করেছেন। আলাওলও অমাত্যসভার কবি। তাই দুজনের মধ্যে রস ও রুচিবোধের সামঞ্জস্য থাকাই স্বাভাবিক। তবে দুজনের ব্যবধান এখানে যে, কাজী দৌলত হৃদয়বৃত্তির এবং আলাওল বুদ্ধিবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন।

আরাকানের প্রধান অমাত্য কোরেশী মাগন ঠাকুর আলাওলের পৃষ্ঠপোষক এবং স্বয়ং একজন কবি। তিনি চন্দ্রাবতী কাব্য রচনা করেছেন—এই কাব্যকাহিনীর উৎস ভারতীয়।

ওয়াকিল আহমদ চন্দ্রাবতীর কাহিনীর সাথে সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামালের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তবে মাগন ঠাকুর দোনা গাজীর মতো ইন্দ্রিয়সর্বস্বতাকে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু দুই কবিই প্রতিভাহীন।

মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতারূপে আলাওল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, নিঃসন্দেহে। এবং তাঁর 'পদ্মাবতী' একটি বিশিষ্ট কাব্য।

আলাওল ভাগ্যবিড়ম্বিত এবং তাঁর জীবনকাহিনী লেখক সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। মাগন ঠাকুরের আজ্ঞায় আলাওল মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দিকাব্য পদমাবতের বাংলা অনুবাদে হাত দেন। তবে আলাওলের রচনা মৌলিক কাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে। আবার জায়সী যেখানে অধ্যাত্মরস প্রশ্রয় দিয়েছেন, সেখানে আলাওল মানবরস মুখ্য করে তুলেছেন। বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে—আবারও বলছি—মানবরসই মুখ্য। আলাওল কাব্যে মানবিক আবেগ-অনুভূতি সঞ্চার করেছেন। আলাওল সম্পর্কে আরও একটি কথা। তিনি একজন উচ্চাঙ্গের সংগীত শিল্পী এবং পদ্মাবতী কাব্যটি গানের সুরে বাঁধা। পরিচ্ছেদ শীর্ষে স্পষ্টভাবে ছন্দ ও রাগিণীর উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবলী, কেদার, ধানসী, তুরি বসন্ত, শ্রীগান্ধার, কর্ণাট

পরিতাল, দক্ষিণান্ত শ্রীরাগ প্রভৃতি রাগিণীর নাম মেলে। কবি প্রেম বিরহ বিলাপ আনন্দ সৌন্দর্য প্রভৃতি ভাবাশ্রিত গান সংযোজিত করে কাব্যটিকে সংগীতধর্মী করে তুলেছেন।

সংগীতশাস্ত্রে কবির পারঙ্গমতা সম্পর্কে আলোচনা করা গেল। এছাড়া তিনি ছন্দবিশারদ। আবার চিকিৎসাশাস্ত্র, অশ্বচালনাবিদ্যা, চৌগানবিদ্যা, বিবাহাচার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান বিস্তর। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যধারায় তাঁর মতো পণ্ডিত কবির সাক্ষাৎ মেলে না।

পদ্মাবতী ব্যতীত আলাওল সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সপ্ত পয়কর, সেকান্দরনামা রচনা করেছেন। কিন্তু ওয়াকিল আহমদ গ্রন্থের মধ্যে প্রথমটি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন, অপর কাব্যগুলো উপেক্ষিত হয়েছে। আশা করব, পরবর্তী সংস্করণে আলাওল সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হবেন।

'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে' সবশেষে আলোচ্য কবি নওয়াজিস খান। তাঁর গুলে বকাওলীর কাহিনী ভারতীয় ও আরবি লোককাহিনীর বিবিধ উপাদান থেকে গৃহীত হয়েছে। এবং কাব্যটিকে নিছক রোমান্স বলে অভিহিত করা যায়। গ্রন্থকার তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির মর্যাদা দিয়েছেন।

পরবর্তীতে গুলে বকাওলী নিয়ে গদ্যে ও পদ্যে যে-কয়টি গ্রন্থ রচিত হয়, লেখক এরও একটি তালিকা দিয়েছেন। সর্বশেষ গ্রন্থ রচিত হয় গদ্যে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে।

সগীরের কাব্য রচিত হয়েছে পনের শতকের প্রথমে। তখন থেকে শুরু করে আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনার ধারা অব্যাহত চলেছে। এবং রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বিশেষ সম্পদ।

চার

বাংলা মুসলমানি পুঁথিসাহিত্য – তথা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান নিয়ে লেখক একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এবং এই ধরনের প্রয়াস এ পর্যন্ত আর কেউ করেছেন কিনা, অন্তত আমার জানা নেই। এদিক দিয়ে আলোচন করলে বলতে হয়, তিনি একটি অসামান্য কাজ করেছেন। তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান শাখার প্রায় সমগ্র পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, এষণা, গবেষণামূলক মনোবৃত্তির আবার রসবোধেরও পরিচয় মেলে।

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মধ্যে যে অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টার পরিচয় মেলে, অনুরূপ নিষ্ঠা ও সযত্ন প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন ওয়াকিল আহমদ 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপ্যাখান' গ্রন্থে। তিনি আধুনিক মনন ও চিন্তা দ্বারা মধ্যযুগের কাব্যের মূল্যায়ন করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের চার-পাঁচশ' বছরের একটি কাব্যধারার ওপর তিনি টিটানের মতো কাজ করে চলেছেন। তবু তাঁর কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। যেমন জয়নুদ্দীনের জঙ্গনামা, আরাকানের কবি মরদনের নছিবনামা, আবদুল হাকিমের লালমতি-সয়ফুলমুলুক, মঙ্গল চাঁদের শাহজালাল-মধুমালা, সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের জেবলমুলুক-শামারোখ, মুহম্দ মুকীমের মৃগাবতী ইত্যাদি আলোচিত হয়নি।

এই সকল কবি ও কাব্য পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে অথবা অন্য কোন গবেষক এই কাজে হাত দিতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়- উত্তরাধিকার কোথায়? সুতরাং তাঁকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' গ্রন্থটি রচনার জন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই এবং গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

মোবাশ্বের আলী*

* অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ও লেখক।